মিজান কাজে চলে যেতে কিছুক্ষন বাড়ীময় অকারণে হাঁটাহাঁটি করল জুলেখা। রান্না করবার দরকার নেই। মিজান আগের দিন রাতে অনেক রান্না করেছে। দিন দুয়েক ভালো ভাবেই চলে যাবে। টেলিভিশন দেখতেও ইচ্ছা করছে না। মিজান দেশী চ্যানেল নিয়েছে কিন্তু টেলিভিশন দেখার তেমন আগ্রহ নেই জুলেখার। মন যখন অস্থির থাকে তখন ওসব ভালো লাগে না। বাইরে বেরিয়ে জঙ্গলের দিক থেকে হেঁটে আসবে কিনা ভাবল একবার। পরে সিদ্ধান্ত পাল্টাল। আজ একটু ঠান্ডা ঠান্ডা। দুপুরের পরে গরমটা বাড়লে তখন যাওয়া যাবে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ডাগরকে চারদিকে আঁতিপাঁতি করে খুঁজল। সে কিংবা তার দুই বাচ্চার কাউকেই দেখা গেল না। হয়ত অন্যদিকে খাবার খুঁজতে গেছে। কাল পরশু আবার চলে আসবে। ফোনটার দিকে তাকাল। কাউকে ফোন করবে? কাকে? কাউকে ফোন করে দুইটা কথা বলার মত মানুষ তার নেই। মিজান ছাড়া। কিন্তু মিজান নিজেই সারাদিনে বিশবার ফোন করছে। তাছাড়া অফিসে সে কখন কাজ করছে কিংবা কখন কোন গুরুত্বপূর্ণ মিটিঙে আছে, জুলেখা কি করে জানবে? অসময়ে ফোন করে হয়ত আরোও বিরক্ত করবে।

খানিকটা আনমনে দোতলায় উঠে এলো জুলেখা। গুটি গুটি করে ওর শোবার ঘরের পাশের একটা বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। মিজান তাকে নিজের থেকে কিছু বলে নি কিন্তু এই বাড়ীতে আসা অবধি জুলেখা লক্ষ্য করেছে, এই কামরাটা সব সময় বন্ধ থাকে। মিজান নিজে সেখানে কখন ঢোকে না। জুলেখাকে যেতে মানা করে নি। কিন্তু জুলেখা জানে মিজান চায় না সে ঐ কামরায় ঢুকুক। কৌতুহলের বশবর্তি হয়ে একবার সে দরজার হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে পরীক্ষা করেছিল। দরজা খোলে নি। তালা বদ্ধ। মিজানকে সে কিছু জিজ্ঞেস করে নি কিন্তু ধরেই নিয়েছিল এখানেই নায়লার সব জিনিষপত্র রেখেছে মিজান, জুলেখার দৃষ্টির বাইরে।

যদিও জানে দরজাটা তালাবন্ধ, তারপরও হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে আরেকবার চেষ্টা করল। খুল্ল না। একটু ভাবল। চাবিটা কোথায় থাকতে পারে? মিজানের রিডিং রুমে একটা ড্রয়ারের মধ্যে অনেক চাবি রাখা আছে, ঘর গোছাতে গিয়ে দেখেছে সে। একবার চেষ্টা করে দেখবে? মিজান টের পেলে কি খুব রাগ করবে? একটু দ্বিধা দ্বন্দ্ব করে ঝুঁকিটা নেবারই সিদ্ধান্ত নিল। ড্রয়ারে অনেকগুলো চাবি পাওয়া গেল। খুব বেশী চেষ্টা করতে হল না। চার পাঁচবার চেষ্টা করতেই দরজা খুলে গেল।

ভেতরে পা দিয়েই থেমে যেতে হল জুলেখাকে। এগিয়ে যাবার মত কোন পথ নেই। বেশ বড়সড় একটা ঘর, ভেতরের জিনিষ পত্র সব বিশাল বিশাল চাদর দিয়ে ঢাকা। চাদরের উপর ধুলা জমেছে। কতদিন এভাবে রাখা কে জানে? নায়লা মারা গেছে প্রায় দু' বছর।

চাদরগুলো সব সরিয়ে নীচের জিনিষপত্রগুলো উন্মুক্ত করল জুলেখা। অবাক হবার পালা তার। কিং সাইজের বিছানা থেকে শুরু করে বিশাল ড্রেসার, আরাম কেদারা, ড্রেসিং টেবিল, কম করে হলেও এক ডজন বিরাট সাইজের বাক্স, কয়েক শ' বাংলা গল্পের বই, মেয়েদের জুতা, ব্যাগ, কয়েক ডজন বিশাল সাইজের ছবি, ইজের, তৈলচিত্র, আরোও কত কি! নায়লার প্রতিটি ব্যবহার্য বস্তু বোধহয় এই কামরায় বন্দী হয়ে আছে। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে চেয়ে থাকে জুলেখা। একজন মৃত মানুষের জিনিষের প্রতি তাকিয়ে থাকতে অনেকের হয়ত খারাপ লাগতে পারে, জুলেখার লাগছে না। মানুষের মৃত্যুকে সে অন্যদের

মত করে দেখে না। সে বিশ্বাস করে মানুষ চলে গেলেও তার আত্মার একটা অংশ পড়ে থাকে তার প্রিয় মানুষদেরকে ঘিরে। তার নানীবু তাকে শিখিয়েছে। নায়লা নিশ্চয় আজও তার প্রিয় বস্তুগুলোর উপর নজর রাখছে। বেঁচে থাকতে কত ভালোবেসে সে তাদেরকে ব্যবহার করেছে, তার মৃত্যুর পর সেগুলোকে এমন করে ময়লা চাদরের নীচে লুকিয়ে রাখার কি কোন যৌক্তিকতা আছে? সে তা হতে দেবে না।

অফিস থেকে কিছুক্ষন পর পরই ফোন করে জুলেখার খবর নেয়াটা একটা অভ্যাসে পরিণত হচ্ছে মিজানের। তার প্রধান দুঃশ্চিন্তা নিরাপত্তা নিয়ে। কিন্তু জুলেখা মনে হয় ব্যাপারটা পছন্দ করছে না। প্রায়ই সে ফোন ধরে না। ভয়েস মেইলে চলে যায়। পরে কল ব্যাকও করে না। জিজ্ঞেস করলে বলবে সে মিজানের কাজের সময় ফোন করে বিরক্ত করতে চায় না। মিজান তাকে বোঝাতেই পারছে না, ফোনে তার কণ্ঠ শুনলে সে কতখানি স্বস্তি বোধ করে। এতো বড় বাড়ী এবং প্রাঙ্গণে একা থাকলেও জুলেখার মধ্যে কোন ভীতিবোধ আছে বলে মনে হয় না। গ্রামে বড় হয়েছে। দিগন্ত বিস্তৃত ফসলের মাঠ, অপেক্ষাকৃত নির্জনতায় সে হয়ত অভ্যস্ত, কিন্তু বাংলাদেশ এবং এখানে এই অজানা অচেনা স্থান কি এক হল? জুলেখার ইংরেজীতেও ব্যুতপত্তি আদৌ নেই। কিছু একটা হলে সে তার সমস্যার কথা কাউকে বলতেও পারবে না। মিজান তাকে নাইন-ওয়ান-ওয়ান কল করে কিভাব পুলিশের সাথে যোগাযোগ করতে হয় শিখিয়েছে, কিন্তু প্রয়োজনের সময় জুলেখা আদৌ সেটা করতে পারবে কিনা তা নিয়ে মিজানের মনে সন্দেহ আছে।

মাইক তাকে অফিসে ফোন করল লাঞ্চের সময়। "সরি, মিজান। একটু শহরের বাইরে গিয়েছিলাম। গাছের ব্যবস্থা করে ফেলব। চিন্তার কিছু নেই।"

মিজানের অবাক হবার পালা। "তুমি এর মধ্যে আমার বাড়ীতে যাওনি?"

"না। মন্ট্রিয়ল গিয়েছিলাম। আজ সকালেই ফিরলাম। আমার সৎ মেয়ের বাচ্চা হয়েছে। খুব করে যেতে বলল।"

"তুমি শিউর?" মিজান আবার জানতে চায়।

"একশ' পার্সেন্ট। কেন, কি হয়েছে?" এবার মাইকের অবাক হবার পালা। "বাড়ীতে সব ঠিক আছে তো?"

"গাছটা কে যেন প্রায় পনের-বিশ ফুট জঙ্গলের দিকে সরিয়ে রেখেছে। আমি ভেবেছিলাম হয়ত তুমি কোন একসময় এসেছিলে।"

হেসে ফেলল মাইক। "একবার ঐ পথে যাবার সময় গাছটা আমি দেখেছি। আমি একা ঐ গাছ এক ইঞ্চিও সরাতে পারব না। কেটে কেটে সরাতে হবে। তুমি শিওর গাছ সরে গেছে? অনেক সময় হঠাৎ দেখে ঐরকম মনে হয়। তুষার সরে যাবার পর সব কিছু অন্যরকম দেখায়"।

শ্রাগ করল মিজান। "তুমি এলেই দেখবে। কখন আসবে?"

"কাল সকালে আসি? শনিবার। তুমি তো বাসায় থাকবে।"

সম্মতি জানিয়ে ফোন রেখে দিল মিজান। গাছের ব্যাপারটা তাকে একটু চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। তার বাড়ির সীমানার মধ্যে এসে কে গাছ সরিয়ে রাখবে? জুলেখাকে জিজ্ঞেস

করতে হবে। সে কিছু দেখেছে কিনা। হয়ত ভুলে গেছে বলতে। যদিও এভাবে তার সীমানার মধ্যে কারো আসার প্রশ্নই ওঠে না। তার অনুমতি ব্যাতিরেকে তো নয়ই।

দেরী করে লাঞ্চ করল জুলেখা। এমনিতে ঘরে শুয়ে বসে কাটায় বলে খুব একটা ক্ষুধা লাগেও না। তারপরও অল্প করে খায়। নাহলে আবার মিজান দেখা যাবে খুব হৈ চৈ শুরু করে দেবে। জুলেখার সব ব্যাপারে এতো চোখ তার। ভালই লাগে, আবার মাঝে মাঝে একটু বিরক্তও লাগে। সব কিছু নিয়ে এতো খবর্দারী করা কি ঠিক? তিনটার দিকে সামান্য একটু খেয়ে জঙ্গলের দিকে রওনা দিল জুলেখা। আজ বার বার বাইরে তাকিয়েছে কিন্তু ডাগরকে দেখেনি। অন্য দিন দু' একটা দল ছুট হরিণ দেখে। আজ তাও দেখে নি। দক্ষিণের বাগানের ফুল গাছগুলো তর তর করে বাড়ছে। ওখানে তেমন কিছু করবার নেই। শুধু অপেক্ষার পালা এখন। ক'দিন বাদেই ফুলে ফুলে ছেয়ে যাবে এলাকাটা। জুলেখার তর সয় না।

সে উত্তরের পায়ে চলা পথ ধরে ঝর্নাটার দিকে রওনা দেয়। পুকুরটার পাশ কাটিয়ে, ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাওয়া চিকন পথটাকে অনুসরণ করে গভীরতর জঙ্গলের দিকে এগিয়ে যায়। তার মনে আছে মিজান বলেছিল উত্তর দিকে কম করে হলেও মাইলখানেক কোন বাড়ী ঘর নেই। জঙ্গলের কতটুকু তার সীমানার মধ্যে মিজান সঠিক জানেও না। এদিকে যেহেতু কেউ থাকে না, সার্ভে করবার প্রয়োজন কখন হয় নি। চারদিকে নানান জাতের গাছপালা, লম্বা লম্বা। অধিকাংশই জুলেখার অপরিচিত। সূর্যের আলো সরাসরি মাটি পর্যন্ত পৌঁছায় না। চারদিকে স্যাঁতস্যাঁতে একটা ভাব। মাটির সোঁদা গন্ধটা ভালোই লাগে জুলেখার। আজও শাড়ী পরে এসেছে। শাড়ীর তলাটা ভিজছে। ভিজুক। ভেজা ভাবটাও ভালই লাগছে। প্যান্ট শার্ট পরতে মোটেই ভালো লাগে না তার। পায়ে জুতা পরবার ব্যাপারটাও রপ্ত করতে পারে নি। সারা জীবন স্যান্ডেল পরে এসেছে। সেই অভ্যাস ভাঙ্গাটা সহজ নয়। গলায় একটা হ্যান্ড ব্যাগ অবশ্য ঝুলিয়ে এসেছে। মোবাইল ফোনটাকে ব্যাগের মধ্যে রেখেছে। মিজান ফোন করে তাকে না পেলে আবার ছুটাছুটি করে বাড়ী ফিরে আসবে। এতো ভয়ে ভয়ে থাকে লোকটা? জুলেখাকে নিয়ে তার ভয় পাবার কোন কারণ নেই, এই সামান্য ব্যাপারটা সে বোঝে না।

পায়ে চলা পথটা বেঁকে গিয়ে পুকুরটার সীমানা বরাবর এগিয়ে গেছে। কিছুদূর যাবার পর বিশাল একটা গাছের পাশে গিয়ে থমকে দাঁড়াল জুলেখা। কম করে হলেও আশি-নব্বই ফুট লম্বা হবে গাছটা। বিশাল কান্ড এবং শাখা প্রশাখা দেখে খানিকটা বট গাছের মত দেখায়। এই গাছটা জুলেখা চেনে। ব্ল্যাক ওয়াল নাট। গাড়ীতে করে ঘুরতে ঘুরতে কোথাও দেখেছিল। মিজানকে প্রশ্ন করে নামটা জেনে নিয়েছে। মিজানের এই ব্যাপারে জ্ঞান খুব ব্যাপক নয়, কিন্তু সাধারণ গাছপালা গুলো চেনে। এদিকে অবশ্য নানা ধরণের মেপল গাছই বেশী।

ব্ল্যাক ওয়াল নাট গাছটার গুঁড়িটা চওড়ায় ছয়–সাত ফুটের কম হবে না। মাটি থেকে ফুট ছয়েক উপরে গিয়ে বিশাল দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। নতুন, সবুজ পাতায় গাছটাকে অপূর্ব সুন্দর লাগছে। এক হাতে গুঁড়িটাকে ছুঁয়ে চারদিকে একবার চক্কর দেয় জুলেখা। পেছন দিকে একটা বড় সড় গর্ত দেখল। হয়ত বাজ পড়েছিল।

মোটামুটি গভীর। দুটি পুর্ণ বয়স্ক মানুষ দিব্যি ধরে যাবে। মুচকি হাসে জুলেখা। তার বাবার বাড়ীতেও পুকুরের পাড়ে একটা বিশাল আম গাছের গুঁড়িতে এমন একটা গুহা ছিল। কত দিন সে একাকী সেখানে গিয়ে লুকিয়ে থেকেছে। মা আর নানীবু তাকে খুঁজে বের করে নিয়ে গেছে। ভেতরে উঁকি দিয়ে মনে হল ভেজা হবে, তারপরও নিজেকে সামলাতে পারল না। একটু কষ্ট করে হলেও গুহার মধ্যে ঢুকে, মাটিতে গুটিসুটি মেরে বসল। ভালই লাগছে। ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। বড় হবার পর সেই আম গাছটাতে সে প্রায় কখনই যায় নি। যাবার সুযোগ হয় নি। অনেক কিছু ঘটে গেছে তার জীবনে।